

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়ঃ রিসালাতের ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে মুমিন বিশ্বাস করেন না। ‘মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল’ একথা বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাঁকে পেতে হলে, তাঁর বন্ধুত্ব, বেলায়াত, সাওয়াব, প্রেম ও করুণা লাভ করতে হলে, তাঁর ইবাদত করতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকলে বা ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর) আদেশের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।”[1]

‘মুখালাফাহ’ (مخالفة) অর্থ ব্যতিক্রম করা বা বিরোধিতা করা (to contradict, to be at variance)। ‘খিলাফ’ (خلاف) অর্থ ব্যতিক্রম, বিপরীত বা অসমঞ্জস (difference, dissimilarity)। এ থেকে আমরা বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর কর্ম, শিক্ষা বা আদর্শের ব্যতিক্রম বা তাঁর পথের ব্যতিক্রম চলা বা তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”[2]

আমরা জানি যে, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করেছি। কাজেই আল্লাহর রাসূলের সামনে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রবর্তী হওয়ার অর্থই আল্লাহর সামনে অগ্রণী হওয়া। কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর শিক্ষা, আদর্শ, পথ ও মত থেকে একটু সামনে অগ্রবর্তী হবে বা দীন বুঝতে, পালন করতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে তাঁর অতিরিক্ত কিছু কর্ম করবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا

“কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দণ্ড করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!”[3]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক হাদীসে তাঁর পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁর রীতি, পদ্ধতি বা কর্মের বাইরে কোনো কর্ম করলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর কর্মের বা আদর্শের বাইরে নব-উদ্ভাবিত কর্ম বা পদ্ধতিকে ‘বিভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।”[4]

এ বিষয়ক আরো অনেক হাদীস আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ‘আত ও বিভক্তি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা মূলনীতি হিসেবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর অনুকরণের ব্যতিক্রম মুমিনের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর। জীবনের প্রতি বিষয়ে ও প্রতি কর্মেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর আদর্শ রয়েছে। আদেশ নিষেধ ছাড়াও তাঁর কর্মরীতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রতি বিষয়েই তাঁর কর্মরীতি অনুসরণ প্রয়োজন। অন্তত তাঁর কর্মরীতিকে অপছন্দ করার পর্যায়ে কোনো মুমিনই যেতে পারেন না। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন :

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ (ﷺ) فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ (ﷺ) قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ". وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর স্ত্রীগণের নিকট যেয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পবরতী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উন্মত, আমাদের উচিত তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত করা)। তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (রাতের বা তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব, কখনই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন: তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে (নফল) সিয়াম পালন করি, আবার মাঝেমাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি- স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার

সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”[5]

এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর রীতিকে অপছন্দ করেননি। তাঁরা তাঁর রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও নিয়েছিলেন, তবে তাঁদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেক আমলের জন্য তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালনও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো পুরুষের প্রয়োজন না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, সম্ভৃতি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর রীতির বাইরে বা অতিরিক্ত কোনো রীতির অনুসরণ করা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্ম করলে বোধহয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত, সম্ভৃতি বা সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না। অবিকল সুন্নাত অনুসরণকারীর চেয়ে অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম রীতিটি তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে। মনে হতে পারে তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করার চেয়ে সারারাত এই মহান ইবাদতে মশগুল থাকাই উত্তম। রাতের অনেকখানি সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি। আর একেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সা’দ বিন আব্বি ওয়াক্কাস (রা) বলেন:

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أَوْمَرَ بِالرَّهْبَانِيَةِ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأُطْعِمَ وَأَنْكِحَ وَأُطْلِقَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“যখন উসমান বিন মাযউন (রা) দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন: আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি, কখনো করি না, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।”[6]

এ অর্থে অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমার আববা আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু ইবাদতের আগ্রহের কারণে আমি রাতদিন নামায রোযায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতাম না। তখন আমার আববা আমাকে অনেক রাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ (ﷺ) فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأُمَسُّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ... ثُمَّ قَالَ (ﷺ) فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فِتْرَةٌ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন সিয়াম পালন কর? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি

বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে সালাত আদায় কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে সালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার স্থিতি-প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার স্থিতি-প্রশান্তি অন্য কিছু দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।”[7]

এখানে প্রশ্ন হলো, উপরের হাদীসগুলিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘সুন্নাত অবহেলা করা’ বা ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করলেন কেন? আমরা সুনিশ্চিত যে, উপরের হাদীসগুলিতে উল্লেখিত সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সুন্নাত বা রীতিকে অপছন্দ করেননি। তাঁরা এমন কিছু করতে ইচ্ছা করেননি যা ইসলামের নিষিদ্ধ। বরং তাঁরা কিছু নেক আমল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর রীতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে পালন করতে আগ্রহ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কেন বারংবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করাকে ‘তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং বললেন যে, যে তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করবে সে তাঁর উম্মাত নয় বা তাঁর সাথে সম্পর্কিত নয়?

বিষয়টি অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে আমি ‘এহইয়াউস সুন্নাহ’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহ, বিদ'আতী আকীদা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় প্রসঙ্গে সুন্নাত বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে সুন্নাতের ব্যতিক্রমে ঈমানের বিচ্যুতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে নিজের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি:

(১) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন তা ততটুকু ও সেভাবে করাই সুন্নাত এবং তিনি যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত।

(২) তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতি ইসলামের অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে জরুরীও হতে পারে, তবে তা কখনোই দীনের অংশ হতে পারে না। তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রম, খেলাফ বা অতিরিক্ত কোনো কর্ম, রীতি বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ বলে মনে করা বা তা পালন না করলে দীন, বেলায়াত, ভক্তি, সাওয়াব বা আখিরাতের মর্যাদা সামান্য পরিমাণ ব্যাহত হবে বলে ধারণা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর পদ্ধতি দীনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করা। এরই অর্থ সুন্নাত অপছন্দ করা। এরূপ বিশ্বাস পোষণ কারী মুহাম্মাদ (ﷺ) –এর রিসালাতের পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়। ফলে সে আর তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে না।

(৩) তাহাজ্জুদের সালাত কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত ফযীলতের ইবাদত। এ সকল সাধারণ দলীলের আলোকে বেশি বেশি তাহাজ্জুদ আদায় বা সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় নিষিদ্ধ নয়। কোনো আবিদ যদি ইবাদতের উদ্দীপনায় তা কখনো করেন তবে তা ক্ষতিকর নয়। তবে তার কর্মের স্থিতি ও নিয়মিত অবস্থান যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর রীতির ব্যতিক্রম হয় তবে তা ক্ষতিকর। কারণ এ পর্যায়ে তিনি ‘সারারাত’ তাহাজ্জুদ আদায়কে রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর চেয়ে অধিক ফযীলত বলে মনে করবেনই এবং বিভিন্ন দলিল দিয়ে নিজের এরূপ কর্মকে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে বাকি সময় তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকবেন।

সর্বোপরি যে ব্যক্তি সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় না করে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটান তার প্রতি তিনি কিছুটা হলেও কষ্ট বোধ করবেন এবং তাঁর বেলায়াত, সাওয়াব বা কামালাত কিছুটা হলেও অপূর্ণ বলে অনুভব করবেন। তার কাছে মনে হবে, এভাবে কিছু সময় ঘুমিনে নষ্ট না করে একটু কষ্ট করে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করলে আরো বেশি কামালাত তিনি অর্জন করতেন! এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর আমল ও রীতিকে ‘অপূর্ণ’ বলে মনে করলেন!! আর এই হলো সুন্নাত অপছন্দ করা।

(৪) সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম বা নেক কর্মের বা রীতির উন্মেষ, উৎপত্তি ও বিকাশ সাধারণত ‘সুন্নাত অবহেলা করা’ বা ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’-র কারণে হয় না, বরং ইসলাম নির্দেশিত ও সুন্নাত সম্মত নেক আমল বেশি করে পালনের জন্য এবং বেশি করে আল্লাহর পুরস্কার ও বরকত লাভের জন্যই তা হয়ে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সকল খেলাফে সুন্নাতই ‘সুন্নাত অপছন্দ করার’ পর্যায়ে চলে যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি।

(৫) ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘এইচআইউস সুন্নাহ’ গ্রন্থে। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্মে আনন্দিত হওয়া, তাঁর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করা বা তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সম্মত ইবাদত। তবে এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী কয়েক শতকের মুসলিমগণের পদ্ধতি ছিল সাধারণ। মীলাদে নববীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্নাত পদ্ধতি ছিল সোমবার সিয়াম পালন করা। আর তাঁর জন্ম জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে যে যখন যেভাবে পেরেছেন তাঁর জন্ম, জীবনী, সীরাত, শামাইল ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। ৭ম হিজরী শতাব্দী থেকে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পদ্ধতি চালু হয়। কয়েক শতাব্দী পরে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটে।

(৬) মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল ‘বিদ‘আত’ বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম। তাঁদের কেউ তা বিদ‘আতে হাসানা এবং কেউ তা বিদ‘আতে সাইয়েয়াহ বলে গণ্য করেছেন। যারা তা বিদ‘আতে সাইয়েয়াহ বলেছেন তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ, জন্ম, জীবনী, সীরাত-শামাইল আলোচনা ও দরুদ-সালাম পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেননি। বরং তারা এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের তাকিদ দিয়েছেন। যারা একে বিদ‘আতে হাসানা বলেছেন তারাও এ সকল ইবাদত পালনের জন্য এ পদ্ধতিকে জরুরী বলে গণ্য করেননি, বরং এ পদ্ধতিকে তারা জায়েয বা বৈধ বলে গণ্য করেছেন।

(৭) কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যারা ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন করেন তারা বিশেষ পদ্ধতিকে দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে বা সাহাবীগণের মত সোমবারে সিয়াম পালন করেন, সর্বদা দরুদ-সালাম পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করেন, কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন না করেন তবে তারা কখনোই তাকে কামিল মুত্তাকি মুমিন বলে মনে করবেন না। তাদের মধ্যে কেউ মনে করবেন লোকটি ভাল, তবে আমাদের মত মীলাদ করলে আরো ভাল হতো। আর কেউ হয়ত বলবেন, যত কিছুই কর না কেন, মীলাদ পালন না করে জান্নাতে যেতে পারবে না। জেনে অথবা না জেনে তিনি ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ বা ‘মীলাদ মাহফিল’কেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ বলে গণ্য করেছেন।

(৮) আরো লক্ষণীয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ সুন্নাতের ব্যতিক্রম, খিলাফে সুন্নাত বা ‘বিদ’আত’ কর্ম বা পদ্ধতির অনুসারী তার মধ্যে এরূপ কর্ম বা পদ্ধতির মুহাববত বা ভালবাসা সাধারণত সুন্নাতের ভালবাসার চেয়ে অনেক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। যিনি মীলাদ মাহফিল বা ঈদ মীলাদুননবী পালন করেন তিনি প্রতি সোমবারে সিয়াম পালন করে অথবা সাহাবীগণের পদ্ধতিতে সীরাত-শামাইল আলোচনা করে তত তৃপ্তি, হাল বা ‘ফায়েয’ লাভ করবেন না যতটা তৃপ্তি, হাল বা ফায়েয তিনি লাভ করবেন আনুষ্ঠানিক মীলাদ পালন করে। এভাবে তার মনের গভীরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে যে, হুবহু সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনে পূর্ণত লাভ সম্ভব নয়।

(৯) খেলাফে সুন্নাতের প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসার একটি বিশেষ দিক এই যে, এরূপ কর্মই মুসলিম উম্মার দলাদলি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। যতদিন মীলাদের উদ্ভাবন হয় নি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্মের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হয় নি। বিষয়টি ছিল উন্মুক্ত। যে যখন যেভাবে পেরেছেন তা পালন করেছেন। ঈদে মীলাদুননবী এবং মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবনের পরে অনেক আলিমই এ বিষয়ক বিতর্ক হাঙ্কা করে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিভক্তি রোধ করা যায় নি। সাধারণভাবে ‘মীলাদের পক্ষের ব্যক্তি’ মীলাদকেই ‘স্বদল’ ও ‘বেদলের’ মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। যদি কেউ আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত পূর্ণভাবে পালন করেন কিন্তু মীলাদ না করেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদতে অবহেলা করেন, কিন্তু মীলাদ পালনের পক্ষে থাকেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের মানুষ বলেই মনে করেন।

(১০) এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের জন্য, তাঁর জন্ম ও জীবনী আলোচনার জন্য বা তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিজের শেখানো ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বরং সুন্নাত পদ্ধতিটি অপূর্ণ বা অচল, নতুন পদ্ধতিতে তা পালন না করা পর্যন্ত মুমিন তার কামালাত, বেলায়াত বা সাওয়াবের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। আর এ-ই হলো ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’।

(১১) এভাবে দীনের যে বিষয়েই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক আমল বা নেক আমলের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেখানেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে দীনের অংশ বলে গণ্য হয়েছে এবং সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

(১২) এভাবে আমরা দেখছি যে, যত ভাল নিয়্যাতেই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম করা হোক চূড়ান্ত পর্যায়ে তা ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’র পর্যায়ে চলে যায়। আর বাহ্যত এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম নেক কর্ম করতে আপত্তি করেছেন। বরং সুন্নাত পালন না করলে যতটুকু আপত্তি করেছেন তার চেয়ে বেশি আপত্তি করেছেন সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে নেক কর্ম করলে। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ মোটেও আদায় করতেন না তিনি তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু ধমক দেন নি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে ইচ্ছা করেছেন তাকে ধমক দিয়েছেন। কারণ সাধারণভাবে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথচ এরূপ সম্ভাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রবল। বাহ্যত এজন্যই কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর মুখালাফাত বা ব্যতিক্রম করতে এবং অগ্রবর্তী হতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এজন্য মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর রিসালাতে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে,

মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর কর্মের, রীতির বা আদর্শের অতিরিক্ত, ব্যতিক্রম বা বিরোধী কোনো কর্ম, রীতি বা আদর্শ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ। আল্লাহর নৈকট্য, কামালাত, তাকওয়া, বেলায়াত, সাওয়াব বা জান্নাত লাভের জন্য তাঁর সুন্নাহের অতিরিক্ত কোনো কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে করার অর্থ তাঁর রিসালাতের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করা। মুমিন হয়ত কোনো কারণে কোনো সুন্নাহ পালনে অক্ষম হতে পারেন, অথবা বৈধ বা অবৈধ ওজরে সুন্নাহের ব্যতিক্রম কর্ম করতে পারেন, তবে সুন্নাহের ব্যতিক্রমকে তিনি কখনোই সুন্নাহের চেয়ে উত্তম, সুন্নাহের সমতুল্য, দীন, সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারেন না। মুমিন কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা করেননি তা না করলে তার দীনের কোনো ক্ষতি হবে বা অপূর্ণতা থাকবে।

ফুটনোট

- [1] সূরা (২৪) নূর: ৬৩ আয়াত।
- [2] সূরা (৪৯) হুজুরাত: ১ আয়াত।
- [3] সূরা (৪) নিসা: ১১৫ আয়াত।
- [4] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩; বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৫৩, ৯৫৯, ৬/২৬২৮, ২৬৭৫।
- [5] বুখারী, আস-সহীহ ৫/১৯৪৯।
- [6] দারিমী, আস-সুনান ২/১৭৯; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৪৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩০১।
- [7] আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদ, নং ৬৪৪১, ৬৬৬৪, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবন হিব্বান ২/৩৯৪, নং ৬৫৩, ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ: ২৭- ২৮, নং ৫১, আলবানী, সাহীহুত তারগীব ১/৯৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13631>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন